মহাবিশ্বে প্রাণ এবং বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্যতা

(প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে -৮)

ফরিদ আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
পৃথিবীর সব গল্প ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :...
--জীবনানন্দ দাশ

ড্রেকের সমীকরণ (Drake's Equation)

বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে সৌর জগতের বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য একদল বিজ্ঞানী এবং প্রকোশলী ১৯৬১ সালে জড়ো হয়েছিলেন ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীনব্যাংক মানমন্দিরে। সম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমত্তা অনুসন্ধানে অগ্রণী কর্মী। তিন দিনের সম্মেলন শেষে জন লিলির (John Lilly) ডলফিনের বুদ্ধিমত্তার গল্প শুনে তারা নিজেদের নামকরণ করেন The Order of the Dolphin হিসাবে।

এই সম্মেলনেই জোতির্বিদ ফ্রাঙ্ক ড্রেক (Frank Drake) সুবিশাল এই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান সভ্যতা পরিমাপ করার একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। তিনি তার এই পদ্ধতি একটি সমীকরণ আকারে উপস্থাপন করেছিলেন। সমীকরণটি নিম্নরূপ,

$$N = R^* . F_p . N_e . F_l . F_i . F_c . L$$

যেখানে,
N= সভ্যতার সংখ্যা
R^*= প্রতি বছর আমাদের ছায়াপথে জন্ম নেওয়া জীবন সহায়ক নক্ষত্রের সংখ্যা
F_p= এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা
N_e= প্রতিটি নক্ষত্রের গ্রহজগতের মধ্যে প্রাণ সহায়ক গ্রহের সংখ্যা

F_l= প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা
F_i= প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা
F_c= বুদ্ধিমান প্রাণী যারা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে।
L= ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল

ড্রেকের সমীকরণে, আমাদের ছায়াপথে প্রতিবছর জন্ম নেওয়া নক্ষত্রের সংখ্যাকে, এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা, যেগুলোতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহজগতের গড় সংখ্যা , প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা, প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা, বুদ্ধিমান প্রাণী মহাবৈশ্বিক যোগাযোগের উপায় বের করেছে এমন গ্রহের সংখ্যা এবং ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কালের ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে N বা মহাজাগতিক সভ্যতার সংখ্যা বের করা হয়।

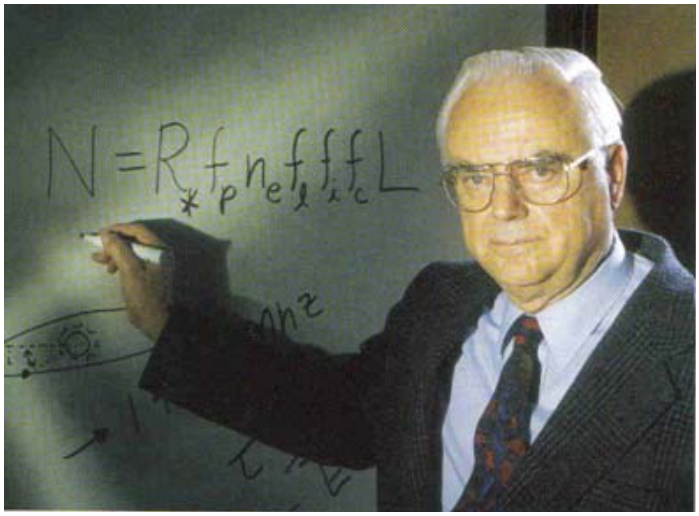

চিত্র ৮.১: ফ্রাঙ্ক ড্রেক এবং তার বিখ্যাত সমীকরণ।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। ধরা যাক, কোন একটি কোন স্কুলের একটি নির্দিষ্ট বছরে পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে কতজন জোতির্বিজ্ঞানী হবে তার একটি ধারণা করা হচ্ছে। মনে করা যাক, এই স্কুল থেকে প্রতিবছর এক হাজার ছাত্র পাশ করে বের হচ্ছে। এই সংখ্যাকে গুন করতে হবে এই ছাত্রদের মধ্যে যারা একদিন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হবে সেই ভগ্নাংশ দিয়ে। ধরা যাক, ৬০ শতাংশ (০.৬) ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে পাশ করে বের হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রদের থেকে প্রতি দশজনের মধ্যে তিনজন বা ৩০ শতাংশ (০.৩) বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে। এদের মধ্যে হয়তো মাত্র ১১ শতাংশ (০.১১) জোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য আবেদন করবে। ধরে নিই নাসা (NASA) প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে জোতির্বিজ্ঞানী নিয়োগ প্রদান করে এবং আবেদনকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে মাত্র এক শতাংশকে কাজে যোগদানের সুযোগ দেয়। এখন, সমস্ত সংখ্যাগুলোকে একত্রে গুন করলে পাওয়া যাচ্ছে ১ (১০০০ x ০.৬ x ০.৩ x ০.১১ x ০.০১ = ১)। অর্থাৎ এই স্কুলের পাশকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজনের জোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

Order of the Dolphin এর সদস্যরা এই সমীকরণের মানগুলির জ্ঞানভিত্তিক অনুমান (educated guess) করার চেষ্টা করেন এবং প্রতিটি মানের বাস্তবভিত্তিক উচ্চসীমা এবং নিম্নসীমা নির্ধারণ করে দেন। যেহেতু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন দেওয়ার মতো সরাসরি পর্যবেক্ষণমূলক যথেষ্ট তথ্য প্রমানাদি হাতে ছিল না, কাজেই মূলতঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন জোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে তাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপর তারা নির্ভর করেছিলেন। যদিও এই মানগুলো তাত্ত্বিক যুক্তির উপরেই মূলতঃ নির্ভরশীল ছিল, তা সত্ত্বেও আজ এতদিন পর তাদের দেওয়া মানগুলোই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত যত ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তার কোনটিই বড় ধরনের কোন মতানৈক্য তৈরি করতে পারেনি সেই মানগুলো সম্পর্কে।

R*- প্রতি বছর আমাদের ছায়াপথে জন্ম নেওয়া জীবন সহায়ক নক্ষত্রের সংখ্যা

ড্রেক যখন তার সমীকরণটি দাঁড় করান তখন এই একটমাত্র ফ্যাক্টর যা প্রকৃত তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ১৯৬১ সালে বিজ্ঞানীরা জানতেন যে মিল্কিওয়ে ছায়াপথ (যাকে আমরা অনেকে ‘আকাশ গঙ্গা’ নামে ডাকি) প্রায় দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে এবং প্রায় কয়েক বিলিয়ন নক্ষত্রের সমাহারে গড়ে উঠেছে এই ছায়াপথ। যদি ছায়াপথ তার জন্মের পর থেকে একই হারে নক্ষত্রের জন্ম দিয়ে থাকে তবে প্রতি বছর প্রায় বিশটি করে নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে। গ্রীনব্যাংকের বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন যে এদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক নক্ষত্রই পৃথিবীর মত গ্রহ থাকার জন্য যথেষ্ট স্থিতিশীল এবং দীর্ঘজীবি হওয়ার কথা। কাজেই তারা R*-এর মান নির্ধারণ করলেন প্রতি বছরে ১০।

আজকে আমরা দূরবর্তী ছায়াপথের গবেষণা থেকে জানি যে ছায়াপথে নক্ষত্রের জন্মহার সময়ের সাথে সাথে কমে যেতে থাকে। আমরা যেহেতু এই মুহূর্তে সভ্যতা খুঁজছি কাজেই আমরা অনেক বেশি আগ্রহী সেই সব নক্ষত্রের প্রতি যেগুলো পাঁচ থেকে দশ বিলিয়ন বছর আগে সূর্যের কাছাকাছি সময়ে জন্ম নিয়েছে। তখন থেকে নক্ষত্রের জন্মহার প্রতি বছরে দশ

থেকে পাঁচে নেমে গেছে যা ড্রেকের অনুমানের চেয়ে অনেক কম। তবে এখানেই কাহিনীর শেষ নয়।

এদের মধ্যে বেশিরই ভাগই হচ্ছে অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, স্বল্প ভরের নক্ষত্র যা লাল বামন (Red Dwarf) নামে পরিচিত। জীবন সহায়ক গ্রহের উপস্থিতির সম্ভাবনা হিসাবে লাল বামন তারাগুলোকে অনেক আগেই বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের নক্ষত্রগুলোকে পরিভ্রমণরত গ্রহগুলোকে পর্যাপ্ত উষ্ণতা পেতে হলে নক্ষত্রের এতখানি কাছাকাছি থাকতে হয় যে এতে করে গ্রহগুলো সমকালীন ঘূর্ণনে (synchronous rotation) আবদ্ধ হয়ে যেতে হয়। 'সমকালীন ঘূর্ণন' হচ্ছে এমন অবস্থা যেখানে গ্রহের এক গোলার্ধ চিরকাল নক্ষত্রের দিকে মুখ করে থাকে ফলে সেই গোলার্ধের তাপমাত্রা হয় অসম্ভব রকমের বেশি। অন্যদিকে অন্য গোলার্ধ যা আজীবনের জন্য অবস্থান করে নক্ষত্রের বিপরীত দিকে তা পরিনত হয় এমনই ঠান্ডায় যে এই গোলার্ধের গ্যাসীয় মন্ডল পর্যন্ত জমাট হয়ে পৃষ্ঠদেশে জমা হয়ে যায়। এই ভয়ংকর চরম তাপমাত্রায় প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করাই দুরূহ। অবশ্য বর্তমানে লাল বামন তারাদের গ্রহদের এই ভয়ংকর পরিবেশের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান গবেষনাসমূহ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, বাতাস উষ্ণ গোলার্ধ থেকে তাপ বহন করে শীতল অংশে নিয়ে যায়। এতে করে উষ্ণ এবং শীতল অংশের সঙ্গমস্থলে এমন একটি সহনীয় পর্যায়ের তাপমাত্রার অঞ্চল তৈরি হয় যে সেখানে জীবনের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

কাজেই সব লাল বামন তারাকে হিসাবের মধ্যে নিলে বর্তমানে R^* এর মান বছরে ৫ থেকে ১০ আসে যা ১৯৬১ সালের হিসাবের অনুরূপ।

F_p- এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা

১৯৬১ সালে জোতির্বিদরা সূর্য ছাড়া এমন একটাও নক্ষত্র খুঁজে পাননি যেটাতে গ্রহমন্ডল আছে। তা সত্ত্বেও Order of the Dolphin এর সদস্যরা সেই সময়কার প্রচলিত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ধরে নিয়েছিলেন যে, এই মহাবিশ্বে গ্রহের উপস্থিতি অতি স্বাভাবিক ঘটনা এবং মহাবিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক নক্ষত্রেরই গ্রহমন্ডল থাকবে বলে তারা মত দিয়েছিলেন।

আজকে আমাদের জ্ঞানের যে পর্যায় তাতে আমরা গ্রীন ব্যাংকের বিজ্ঞানীদের চেয়ে আরো ভালভাবে এই হিসাব করতে পারি। ১৯৯৫ সাল থেকে বিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকটি দল ১৭০ টিরও বেশি নক্ষত্র খুঁজে পেয়েছেন যাদের আমাদের সৌরজগতের মতই গ্রহজগত রয়েছে। যে সমস্ত নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে কমপক্ষে দশ শতাংশেরই গ্রহজগত আছে। তবে এ সংখ্যাও যে পুরোপুরি সঠিক তা বলা যায় না। বর্তমান প্রচলিত প্রযুক্তি নেপচুনের

চেয়ে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে কক্ষপথে ভ্রাম্যমান গ্রহদেরকে চিহ্নিত করতে পারে না। এর মধ্যে আবার বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের এমন সব জায়গায় গ্রহ আবিষ্কার করছেন যেখানে গ্রহ থাকার সম্ভাবনাকে একসময় নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে দ্বৈত নক্ষত্রের (Double Stars) কথা বলা যেতে পারে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের জিওফ মার্সির (Geoff Marcy) মতে মহাবিশ্বে গ্রহসহ নক্ষত্রের সংখ্যা সম্ভবত নব্বই শতাংশের মতো।

N_e- প্রতিটি নক্ষত্রের গ্রহজগতের মধ্যে প্রাণ সহায়ক গ্রহের সংখ্যা

একসময় বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতে ভেনাস থেকে মঙ্গল পর্যন্ত একটি কাল্পনিক এলাকাকে প্রাণের সহায়ক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন যদিও ভেনাস এবং মঙ্গলকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমাদের সৌরজগতে একটিমাত্র গ্রহ পৃথিবীতেই শুধুমাত্র প্রাণ-সহায়ক পরিবেশ আছে বা প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। কাজেই এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা ওই সময় N_e এর মান হিসাবে ১ কে ধরে নিয়েছিলেন।

গত কয়েক দশকের সবচেয়ে বিস্ময়কর উপলব্ধি হচ্ছে যে প্রাণকে একসময় যতটা নাজুক মনে করা হতো আসলে তা নয়। প্রাণ অনেক কঠিন পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। আমাদের সৌরজগতের অনেক গ্রহকেই আগে যতখানি রুদ্রমুর্তির মনে করা হতো তারা আসলে ততখানি নিষ্ঠুর নয়। কিছু চরমজীবী (extremophiles) পাওয়া গেছে সাগরের তলদেশে যেখানকার তাপমাত্রা ফুটন্ত পানির চেয়েও বেশি, পাওয়া গেছে হীমশীতল মেরুর বরফের মধ্যে, পাওয়া গেছে মাটির অনেক গভীর তলদেশে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমনই শক্তপোক্ত যে তাদের টিকে থাকার জন্য কোন অক্সিজেনেরই প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের প্রাণীদের পক্ষে মঙ্গলের ভূগর্ভস্থ সাগরে, কিম্বা বৃহস্পতির তিন বরফে আচ্ছাদিত উপগ্রহের জমাট বরফের নিচের জলীয় অংশে বা শনির উপগ্রহ টাইটানের হাইড্রো-কার্বন আচ্ছাদিত পৃষ্ঠদেশের নিচে অবস্থিত পানিতে খুব অনায়াসেই টিকে থাকা সম্ভব। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের প্রাণ-সহায়ক এলাকার ধারণা আগে ছিল অনেক বেশি সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, প্রত্যেকটা গ্রহমন্ডলেই একাধিক গ্রহ থাকতে পারে যেখানে প্রাণের জন্য সহায়ক পরিবেশ বিদ্যমান।

F_l- প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা

ড্রেকের সমীকরণের ভিতরে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই এর রাশিগুলোর মান অনিশ্চিত হতে থাকে। আমরা এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহতে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। কাজেই আমাদের কাছে কোন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নেই যার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে

পৌছাতে পারি যে জীবনের বিকাশ হঠাৎ করে একবারই ঘটেছে নাকি এর উৎপত্তি মহাবিশ্বে অনিবার্য ছিল।

দিন দিন অবশ্য যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার ক্ষেত্রই উজ্জ্বল হচ্ছে। পৃথিবীতে প্রাণের মৌলিক উপাদান হচ্ছে পানিসহ মাত্র ডজন দু'য়েক অণু। আর এ সমস্ত অণু নক্ষত্রের জন্মস্থান নাক্ষত্রিক মেঘে বিপুল পরিমানে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে গ্রহসমূহে জমাট আকারে থাকা কার্বন কনিকা গুলো প্রোটিন গঠনের উপাদান এমিনো এসিড তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। এ ব্যাপারটি সত্যি হলে ছায়াপথের যে কোন নক্ষত্রেই গ্রহ জন্মের সময়ই এতে জীবন গঠনের উপাদানসমূহ থেকে যাওয়ার কথা।

ড্রেক এবং তার সহকর্মীরা খুব পরিমিতভাবেই F_l এর মান ধরেছিলেন দশ শতাংশ যা এখনকার পরিপ্রেক্ষিতেও যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এই মান লাফ দিয়ে বেড়ে যেতো যদি পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো।

F_i- প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা

স্টিফেন জে গুল্ড (Stephen Jay Gould) মানুষকে 'বিবর্তনের দুর্ঘটনা' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসের সামান্যতম হেরফের হলেই হয়তো আমরা এই ধরণীতে অবতীর্ণ হতাম না। কিন্তু কথা হচ্ছে মানুষ না থাকলেও বিবর্তন কি অন্য কোন চিন্তাশীল বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ ঘটতো? অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বুদ্ধিমত্তা কি এতই অত্যাবশ্যকীয় যে তা আজ হোক বা কাল হোক আত্মপ্রকাশ করবেই?

একটা উপায়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, তা হচ্ছে পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণী বুদ্ধিমত্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা? ডলফিনের ফসিলের খুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গত পঞ্চাশ মিলিয়ন বছরে এর মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত। আরো অসংখ্য প্রাণী বিশেষ করে কিছু তিমি এবং পাখি গত দশ মিলিয়ন বছরে তাদের শরীরের তুলনায় ক্রমবর্ধমানহারে মগজের আকৃতি বৃদ্ধি করে চলেছে। কয়েক দশক আগে ড্রেক এবং তার সহযোগীরা F_i -এর মান ধরে নিয়েছিলেন ১ এর কাছাকাছি। বর্তমানে আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে যে, বিবর্তনের যাত্রাপথ বুদ্ধিমত্তার উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করে।

F_c- বুদ্ধিমান প্রাণী যারা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে।

কোন একটা প্রাণী বুদ্ধিমান হলেই যে মহাকাশে বেতার তরঙ্গ পাঠাবে তা নাও হতে পারে। কারণ হতে পারে এ মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্রহ আছে যার অধিবাসীরা হয়তো দক্ষ ভাষাবিদ, অসাধারণ কবি, সুরকার কিন্তু বেতার জ্যোতির্বিদ্যায় অক্ষম। ফলে তাদের পক্ষে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ বা শ্রবণ হয়ত সম্ভব নয়। এমনকি আমাদের পৃথিবীতেও খুব কম সংখ্যক জাতিই বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রাচীন গ্রীস বা ভারতবর্ষের কথা বলা যায়। এখানে দার্শনিক উন্নয়ন যতটা হয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। সব জাতিকেই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটাতে হবে তা কিন্তু নয়।

তারপরও এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে কোন একটি প্রজাতির যদি কথা বলার মতো বুদ্ধিমত্তা থাকে এবং সেই সাথে সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি যেমন হাতুড়ি বাটালের ব্যবহার করতে জানে তবে সেই প্রজাতি বিজ্ঞান, যান্ত্রিক প্রযুক্তি এবং পরবর্তীতে বেতার প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হবেই। বৈজ্ঞানিক কোন আবিষ্কার ঘটবার পর পরই এটি এতোই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে তা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। কোন কোন সমাজ হয়তো আদিম চাকা পর্যায়ে আটকে যেতে পারে, কিন্তু মাত্র একজন বিজ্ঞানীই হয়তো সেই অবস্থা থেকে উত্তোরণ ঘটিয়ে দিতে পারেন। যেমন করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল ১৮৬৪ সালে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের মিথস্ক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে। এরপর মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই অসংখ্য ব্যক্তি আদিম ধরনের বেতার যন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন। দুই প্রজন্ম পরেই ড্রেক এমন একটি বেতার ডিশ ব্যবহার করেছেন যা কয়েক আলোকবর্ষ দূরের সঙ্কেত গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। কাজেই F_c-এর মান আগের মতোই একশ শতাংশের কাছাকাছি বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

L-ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল

মহাবিশ্বে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেওয়া সত্ত্বে যদি প্রযুক্তিগত সভ্যতাগুলো নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলে তবে আমরা তাদেরকে খুঁজে পাবো না। ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে অনেক গবেষকই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন এই ভেবে যে প্রযুক্তিগত সভ্যতার আয়ুষ্কাল হয়তো অস্বাভাবিক রকমের স্বল্প দৈর্ঘ্যের- মাত্র শ' দুয়েক বছর বা তারও কম। বেতার প্রযুক্তি উদ্ভবের দক্ষতার জন্য যে ধরনের সময়ের প্রয়োজন তা পারমানবিক প্রযুক্তির দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের প্রায় কাছাকাছি। কাজেই বিজ্ঞানীদের যুক্তি ছিল যে, বেতার সম্প্রচার শুরু করার পরপরই হয়তো আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ব্যবহৃত পারমানবিক অস্ত্রে কারণে সেই সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

আত্মধ্বংস ছাড়াও স্রেফ প্রাকৃতিক কারণেও কোন সভ্যতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন, এটি হতে পারে কাছাকাছি কোন নক্ষত্রে সুপারনোভা বিস্ফোরণের কারণে। এ ধরণের

সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটে কোন কোন তারার একেবারে 'মরণ দশায়', যখন তারাটি তার সমস্ত জ্বালানী একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। এদের অনেকগুলোই তখন আভ্যন্তরীণ প্রচন্ড মহাকর্ষের চাপ আর বিপরীতমুখী তাপীয় চাপের টানা-পড়েন সইতে না পেরে নিজের বাইরের খোল-নলচে উপরে ফেলে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় আর মহাকাশে প্রচন্ড শক্তি নির্গত করে। সে শক্তির এমনই তেজ যে শত সহস্র আলোক বর্ষ দূরের গ্রহ থেকেও আলোর ঝলকানি টের পাওয়া যায়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান কেপলার এমনি এক সুপারনোভা বিস্ফোরণ দেখেছিলেন ১৬০৪ সালের ৯ ই অক্টোবর, যেটি ঘটেছিল পৃথিবী থেকে ২০ হাজার আলোক বর্ষ দূরের কোন এক নক্ষত্রে (চিত্র : ৮.২)। ওই নক্ষত্রটি যদি এত দূরে না থেকে পৃথিবীর কাছাকাছি থাকত তবে তবে পৃথিবীর 'জীবন লীলা' যে তখনই সাঙ্গ হত তা বলাই বাহুল্য। কাজেই মহাবিশ্বের কোথাও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটলেও তার কাছাকাছি সুপারনোভা বিস্ফোরণ কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে তা বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে আমাদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ করার আগেই।

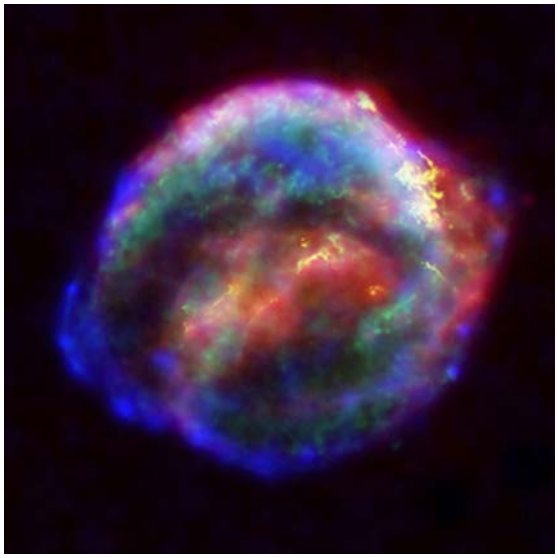

চিত্র ৮.২: সুপারনোভা এসএন ১৬০৪ এর ভগ্নাবশেষের ছবি (চন্দ্র এক্স রে মানমন্দির থেকে প্রাপ্ত)

গত দশকে এই হতাশাজনক চিন্তাভাবনার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে কোন দূরবর্তী গ্রহে গণবিলুপ্তি ঘটলেও প্রাণের বিকাশ পুরোপুরি রুদ্ধ নাও হতে পারে, কিংবা পুনর্বার সেখানে প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। যেমন, আমাদের পৃথিবীতেই চার থেকে সাড়ে চার কোটি বছর আগে যে গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছিল, যাকে 'অর্ডোভিসিয়ান-সিলুরিয়ান এক্সটিংকশন' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তার পেছনে সম্ভবতঃ সুপারনোভা বিস্ফোরণই ছিল দায়ী। তারপরও দেখা গেছে গণবিলুপ্তির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পন না করে সর্বংসহা পৃথিবী প্রাণে প্রাণে স্পন্দিত হয়েছে পুনর্বার।

আবার প্রাযুক্তিক অগ্রগতির অনিবার্যতাকে যদি মানুষের মত কোন উন্নত সভ্যতা আত্মধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তা হলেও সে গ্রহে কিছু প্রজাতি, বিশেষ করে 'নিম্ন প্রজাতির' অণুজীবেরা টিকে থাকতে পারে। এরপর কি সে গ্রহে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আবারো আরেক বুদ্ধিমান প্রজাতির অভ্যুদয় ঘটবে? এটা জানার কোন উপায় নেই। তবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটি অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আমরা জানি জুরাসিক যুগে ডায়নোসরেরা অন্য প্রাণীদের তুলনায় জৈবিকভাবে অনেক অগ্রসর ছিল। তারপরও পৃথিবীর বুকে এক বিশাল উল্কাপাতের ফলে আজ থেকে সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে তারা সার্বিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে সময় টিকে ছিল কিছু তুচ্ছ স্তন্যপায়ী প্রাণী। সেই স্তন্যপায়ী জীবদের থেকেই সাড়ে ছ'কোটি বছরের বিবর্তনের ফল আমরা- আজকের মানুষেরা। আজকের মানুষেরা যদি এ মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়, হয়ত আরো সাড়ে ছ' কোটি বছর পর এ ধরণীতে আরেক বুদ্ধিমান প্রজাতির অভিব্যক্তি ঘটবে। তারাও যদি কোন আন্তঃ কলহ, পারমানবিক যুদ্ধ কিংবা স্টার ওয়ারের ভিতর দিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আরো সাড়ে ছ' কোটি বছর পর আরো এক বুদ্ধিমান এবং উন্নত সভ্যতার উদ্ভব হতে পারে। এবং এই প্রক্রিয়া হয়ত অব্যাহত থাকবে। সূর্যের মত মাঝারি গোছের নক্ষত্রের আয়ু ধরা হয় পাঁচশ কোটি বছর। আর বুদ্ধিমান প্রজাতির বিলুপ্তি আর অভ্যুদয়ের প্রতিটি পর্ব যদি সাড়ে ছয় কোটি বছর হয়, তবে ওই পাঁচশ কোটি বছরে সাতাত্তর বার বুদ্ধিমান প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে। এটি একটি সুযোগ বটে, পৃথিবীর জন্য, এবং মহাকাশের অন্যান্য গ্রহের জন্যও। হয়ত এমনও হতে পারে, সর্বশেষ বুদ্ধিমান প্রজাতিটি তাদের পুর্ববর্তী 'বুদ্ধিমান' প্রজাতিগুলোর নির্বুদ্ধিতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মধ্বংস পরিহার করার উপায় বের করে ফেলবে, নিজেদের সভ্যতাকে মহাকাশের অন্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করে ফেলবে।

আত্মধ্বংস ছাড়াও বিজ্ঞানীদের উপর ভিন্ন ধরনের অন্য এক দুঃশ্চিন্তা এসে ভর করেছে। বর্তমানকালে টেলিভিশন সম্প্রচারের জায়গা অতি দ্রুত দখল করে নিচ্ছে ফাইবার অপটিক কেবল এবং সরাসরি সম্প্রচারের স্যাটেলাইট। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো পৃথিবীতে আর কোন বেতার সঙ্কেত থকবে না। এই ধরনের প্রযুক্তিগত বিবর্তন ভিনগ্রহের সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে L এর মান ছোট হতে বাধ্য। প্রযুক্তিগত সভ্যতার আত্মধ্বংস বা যোগাযোগের মাধ্যমের উন্নতির ফলে বেতার-প্রযুক্তিগত যোগাযোগ নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া সম্ভব, তা সে যে কোন কারণেই হোক না কেন। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত মানব সভ্যতার মাত্র গত ষাট বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা। নাটকীয়ভাবে এই পরিস্থিতি পালটেও যেতে পারে। যখন কোন প্রযুক্তিগত সভ্যতা রকেট আবিষ্কার করে তখন সেই সভ্যতা আশে পাশের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করবে এটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। আর এর জন্য তারা হয়তো

তৈরি করবে তাদের সৌরজগত বিস্তৃত GPS, যা থেকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হবে বেতার সঙ্কেত।

ড্রেক L-এর মান নির্ধারণ করেছিলে ১০,০০০ বছর। অন্যেরা কেউ এর মান ধরেছেন ড্রেকের চেয়ে অনেক কম, আবার কেউ কেউ এর মান ধরেছেন ড্রেকের চেয়ে অনেক বেশি। এটাই এই সমীকরণের একমাত্র রাশি যেখানে অনুমান করা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

N: এবং উত্তর হচ্ছে .....

ড্রেক এবং তার অনুগামীরা যখন তাদের সর্বোত্তম অনুমানগূলো সমীকরণে প্রয়োগ করেছিলেন তখন এর মান বের হয়েছিল কয়েক হাজার। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব এতোই স্বাভাবিক যে পৃথিবী থেকে একহাজার আলোকবর্ষ দূরেই ভিনগ্রহের সভ্যতা থাকার কথা।

ড্রেক এবং তার অনুগামীদেরকে ভবিষ্যত বক্তা হিসাবে আখ্যায়িত করলেও খুব একটা ভুল হবে না। বর্তমান সময়ের সমস্ত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী ড্রেকের সমীকরণ এখনো শক্ত ভিতের উপর দাড়িয়ে আছে। ড্রেক নিজেই বলেন, 'আমাদের ওই সময়কার অনেক অনুমানই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে।'

অবশ্য এর বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারতো। জোতির্বিজ্ঞানীরা হয়তো আবিস্কার করতে পারতেন যে, এই মহাবিশ্বে গ্রহ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, অথবা প্রাণের বিকাশের মত উপযোগী অঞ্চল খুবই কম। কিন্তু তার পরিবর্তে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের ক্রম অগ্রসরমান জ্ঞান ড্রেকের সমীকরণের যথার্থতাই শুধু প্রমাণই করছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা একে ছাড়িয়েও যাচ্ছে। যার কারণে গত ছেচল্লিশ বছরের ফলাফলহীন সন্ধানের পরও অনেক বিজ্ঞানীই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই বিপুল মহাবিশ্বে আমরা হয়তো একা নই।

মাইকেল ক্রিসটন (Michael Christon) ড্রেকের সমীকরণকে 'ফালতু' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। যেহেতু ড্রেকের সমীকরণ পরীক্ষা করা যায় না কাজেই এটি বিজ্ঞান নয় বলে তিনি দাবী করেন। তার মতে, ড্রেকের সমীকরণ বিজ্ঞানের নামে 'ক্ষতিকর আবর্জনা' তৈরির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

যেহেতু ড্রেকের সমীকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মানগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করা সম্ভবপর নয়, কাজেই ড্রেকের সমীকরণের উত্তরও মোটামুটি অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে ক্রিচটনের এই সমীকরণকে একেবারেই 'ফালতু' বলাটা পুরোপুরি ঠিক হয়নি। ড্রেকের সমীকরণ বিভিন্ন সমস্যাগুলো কিভাবে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কযুক্ত তাই ব্যাখ্যা করে, এদের সংখ্যাগত মান আমরা জানি কিনা সেটা মুখ্য বিষয় নয়। জোতির্বিজ্ঞানীরা খুব ভাল করেই জানেন যে, ড্রেকের সমীকরণ কোন কিছুই এই মুহূর্তে হাতে নাতে প্রমাণ করতে পারে না। এই সমীকরণকে তারা দেখে থাকেন জটিল কোন বিষয়কে খন্ড খন্ড অংশে ভেঙ্গে সমাধানের উপায় হিসাবে। এ ধরনের বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক চিন্তার জগতে হরহামেশাই হচ্ছে। নতুন পর্যবেক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনে ড্রেকের সমীকরণকে পরিবর্তন করা যেতে পারে বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপনও করা যেতে পারে। তবে বিষয়টির সুত্রপাত হিসাবে এই সমীকরণের ভূমিকা কিন্তু থেকেই যাবে।

প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে আমরা জানি, এরিস্টারকাস (Aristarchus) সর্বপ্রথম সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব (Helicentric View) এবং ডেমোক্রিটাস (Democritus) বস্তুর 'পারমানবিক তত্ত্ব' প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাদের এই ধারণা পরীক্ষা করা তাদের পক্ষে বা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেই সময় ক্রিচটনের মতো কিছু ব্যক্তিও নিশ্চয়ই ছিল যারা ওই সমস্ত ধারণাকে ক্ষতিকর হিসাবে মত দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু এই ধারণাগুলো নীরবে শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করে থেকেছে কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। আধুনিক এটমিক থিওরীর পথিকৃৎ এই বিজ্ঞানীরা প্রাচীন সেই ধারণাগুলো পরীক্ষা করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হয়তো কয়েক শতাব্দী লেগে যেতে পারে কিন্তু একদিন যে ড্রেকের সমীকরণ এবং এর সকল উপাদান পরীক্ষনযোগ্য (Testable) হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ফার্মির গোলকধাঁধা : তারা সবাই কোথায়?

ড্রেকের আগেও অনেকেই মহাজাগতিক সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন বিখ্যাত পদার্থিবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি (Enrico Fermi)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় ফার্মি কাটিয়েছেন লস অ্যালামস-এ ম্যানহাটন প্রজেক্টে পারমানবিক বোমা তৈরিতে সাহায্য করার জন্য। তবে সব খারাপ দিকেরই আবার দু' একটি ভাল দিক থাকে। মানব বিধ্বংসী এই প্রজেক্টের সবচেয়ে 'আলোকিত' দিক ছিল যে, সভ্যতার কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কিছ সংখ্যক অসম্ভব প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বেশ কিছুটা অবসর সময় পেয়েছিলেন। এই অবসর সময়কে তারা কাজে লাগিয়েছেন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়। এরকমই এক আলোচনায় লাঞ্চ টেবিলে ফার্মি যুগান্তকারী এক মন্তব্য করেন যা নিয়ে এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনার কমতি নেই।

ফার্মি চিন্তা করে দেখলেন যে, আমাদের এই মহাবিশ্বে যদি অসংখ্য সভ্যতা থাকে তাদের অনেকেরই হাজারখানেক বছরের মধ্যেই আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণে পারদর্শী হয়ে উঠবার কথা। আলোর গতিতে না চলুক, তার চেয়ে অনেক কম গতিসম্পন্ন (যেমন, আলোর বেগের এক থেকে দশ শতাংশ বেগে) যানবাহনে করেই এই আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ সম্ভব। আর সেক্ষেত্রে আরো বেশী কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন সভ্যতারই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পুরো গ্যালাক্সী দখল করে নেওয়ার কথা। ৩৭.৫ লক্ষ বছরের মধ্যেই বছরের মধ্যেই প্রতিটি নক্ষত্রজগত সেই সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যাওয়ার কথা (চিত্র ৮.৩)। কিন্তু আমাদের চারপাশে এ ঘটনার কোন প্রমাণ আমরা দেখতে পাইনা। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ফার্মি প্রশ্ন ছুড়ে দেন যে, 'তারা কোথায়?' (Where are they?) এটাই ফার্মি প্যারাডক্স (Fermi Paradox) বা ফার্মির গোলকধাঁধা নামে বিখ্যাত।

ফার্মির গোলকধাঁধার প্রত্যুত্তর হিসেবে এখন পর্যন্ত অসংখ্য সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন, ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন ওয়েব নিজেই গোটা পঞ্চাশেক সমাধানকে আলোচনায় এনেছেন (Webb, 2002)। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে এর সবগুলো নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়; আমরা প্রধাণ কয়েকটি নিয়ে এখানে আলোচনা করবো।

হয়ত মহাজাগতিক সভ্যতা বলে কিছু নেই

ফার্মি প্যারাডক্সের সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, এই মহাবিশ্বে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। বুদ্ধিমান প্রাণীসত্তা এই মহাবিশ্বে কেন অপ্রতুল বা স্বল্পস্থায়ী যে বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে।

যারা বিশ্বাস করেন যে, আমরা ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এই মহাবিশ্বে নেই, তারা যুক্তি দেন যে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বা জটিল জীবন উদ্ভব খুবই দুর্লভ বা বলা যেতে পারে পৃথিবীতেই শুধুমাত্র ঘটেছে। একে বলা হয় 'বিরল পৃথিবী অনুকল্প' (Rare Earth Hypothesis)। পৃথিবীতে প্রাণ বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একটাই প্রজাতি মহাকাশযান কিংবা বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়টিকে সামনে এনে এর প্রবক্তারা যুক্তি দেন যে প্রযুক্তিগত সভ্যতা মহাবিশ্বে বিরল হতে বাধ্য।

এ বিষয়ে অন্য একটি যুক্তি হচ্ছে যে, মহাবিশ্বে প্রাণ বিকাশের পরিবেশ হয়তো সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু জীবন তৈরি হওয়া, জটিল অণুসমুহের একই সাথে সমপ্রতিরূপ তৈরি করা,

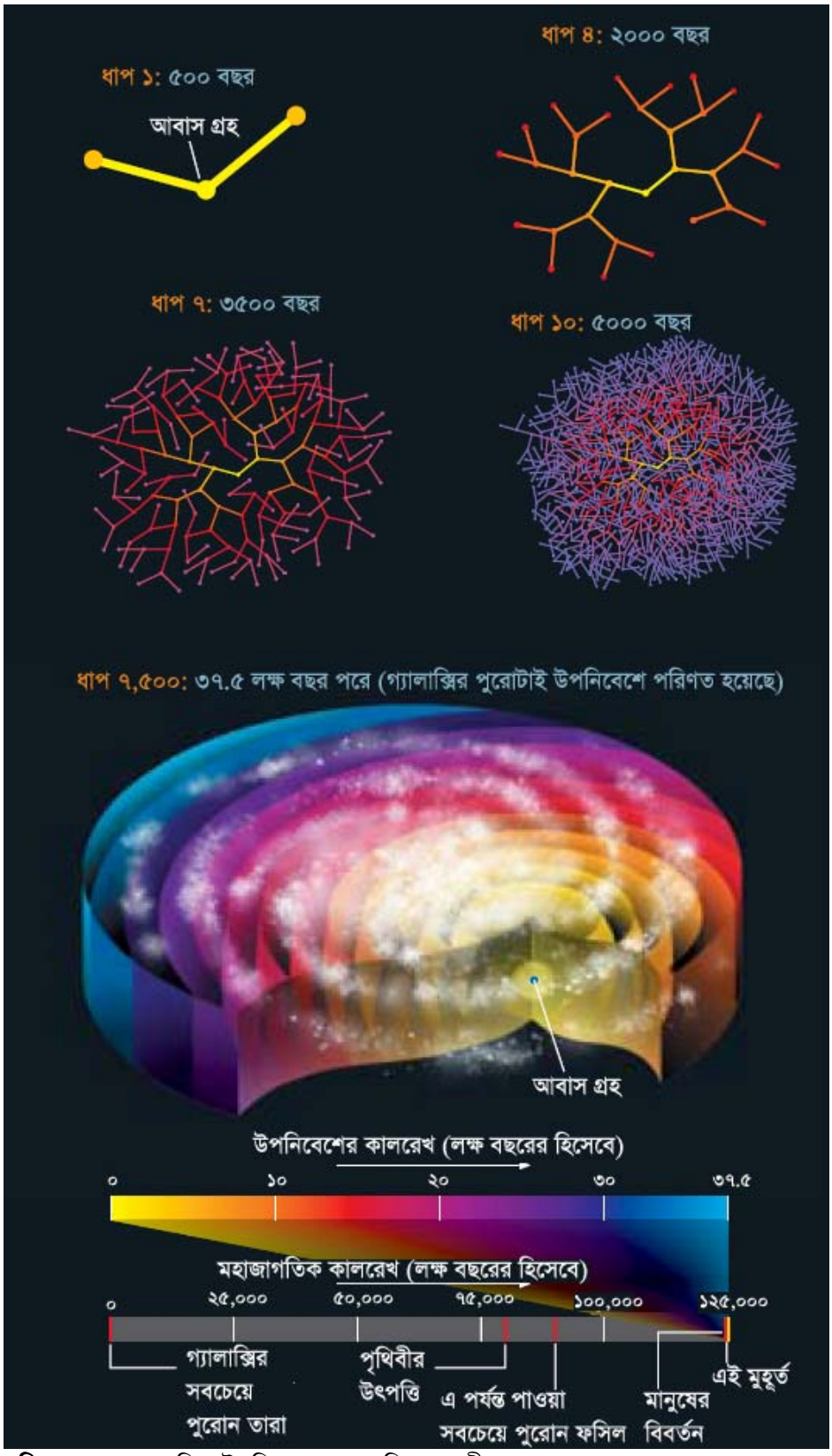

চিত্র ৮.৩: মহাজাগতিক উপনিবেশ: কোন বুদ্ধিমান প্রাণী ৩৭.৫ লক্ষ বছরের মধ্যে তাদের পুরো গ্যালাক্সি অধিকার করে নিতে পারে।

এমনভাবে শক্তি গ্রহণ করা যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ ঘটানো সম্ভব ইত্যাকার বিষয় সমূহ প্রাণের জন্য প্রাক-পরিবেশ বিদ্যমানকারী গ্রহে নাও ঘটতে পারে।

অন্য একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, প্রাণ হয়তো প্রতি মুহূর্তেই মহাবিশ্বের সর্বত্র তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বরফ যুগ বা অন্য কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ জটিল প্রাণ বিকাশে বাধা দিচ্ছে। প্রাণ বিকাশের পরিবেশ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার না হলেও এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি মুহূর্তে ঘটে সেই সমস্ত গ্রহে প্রাণকে ধ্বংস করে দিয়েছে বা দিচ্ছে।

মহাজাগতিক সভ্যতা আছে তবে....

প্রযুক্তিগত সভ্যতা হয়তো এই মহাবিশ্বে আছে তবে তারা এতো দূরে যে কার্যকর কোন যোগাযোগ তাদের সাথে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দু'টো সভ্যতা যদি কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত হয় তবে এটা খুবই সম্ভব যে, তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করার আগেই নিজেরাই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। মানবীয় অনুসন্ধানে তাদেরকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তবে দূরত্বের কারণে যোগাযোগ করাটা আসলেই অসম্ভব হয়ে থাকবে।

অন্য একটি সম্ভাবনা হচ্ছে যে যেহেতু আন্তঃনক্ষত্রিক পরিভ্রমণ খুবই ব্যয়বহুল কাজেই কোন মহাজাগতিক সভ্যতাই উপনিবেশ তৈরির ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়। আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব, এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মহাজাগতিক সভ্যতার বিভিন্ন নক্ষত্রজগতে উপনিবেশ তৈরির অনুমানসমূহ গড়ে উঠেছে। যদিও পদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান সূত্রসমূহ আলোর চেয়ে গতিশীল কোন মহাকাশযানের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়, কিন্তু এর চেয়ে কম গতিশীল নভোযান পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই লংঘন না করে তৈরি করা সম্ভব। অবশ্য এটা সম্ভব যে, আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আন্তঃনাক্ষত্রিক উপনিবেশ গড়ার সম্ভাবনা এবং ব্যয় সম্পর্কে এখনো পর্যাপ্ত নয়।

১৯৩৭ সালে বেতার টেলিস্কোপ আবিষ্কারকে বিভক্তি রেখা হিসাবে ধরলে মানুষের বহির্জাগতিক সভ্যতার অস্তিত্ব সনাক্ত করার সময়সীমা কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। ভূতাত্ত্বিকভাবেও এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে দুই লাখ বছর আগে। মাত্র দুই লাখ বছর মহাজগতিক সময়ের মাপকাঠিতে একেবারেই নগণ্য। কাজেই এটা সম্ভব যে মানুষ খুব বেশি দিন আগে থেকে অনুসন্ধান শুরু করে নি এবং মহাজাগতিক সভ্যতার নজরে পড়ার মতো খুব বেশি দিন আগেও এই ধরায় আগমন ঘটেনি।

কৃত্রিম বেতার তরঙ্গ পৃথিবী থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া শুরু হয়েছে ১৮৯৫ সালে পপভ (Popov), মার্কনি (Markoni) এবং টেলসা (Telsa) প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু করার পর থেকে। এর মানে হচ্ছে এখন পর্যন্ত মাত্র ৫৫ আলোকবর্ষ দূরের কোন সভ্যতার পক্ষেই শুধুমাত্র পৃথিবী থেকে পাঠানো বেতার সঙ্কেত রিসিভ করে আবার প্রতি উত্তর পাঠানো সম্ভব। অথবা এমনও হতে পারে প্রথম দিকের সঙ্কেতগুলো এতোই দূর্বল ছিল যে সেগূলোকে সনাক্ত করাও সম্ভব নয়। ১৯৫৭ সালের পর থেকে মহাকাশ যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে যে বেতার সঙ্কেতগুলো পাঠানো হয়েছে সেগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল বিধায় সনাক্ত করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মাত্র ২৪ আলোকবর্ষ দূরের মহাজাগতিক সভ্যতাই মানুষের যোগাযোগের আওতায় আছে। সময়ের সাথে সাথে এই যোগাযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কিংবা এমন হতে পারে আমাদের গ্রাহক যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট উন্নত নয় বিধায় আমরা তাদের সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারছি না।

পৃথিবীকে ইচ্ছা করেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে (The Zoo Hypothesis)

মহাজাগতিক সভ্যতা মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে এই বিশ্বাস একধরনের ভ্রমাত্মক যুক্তি বা হেত্বাভাস (Fallacy) হতে পারে। যোগাযোগের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মহাজাগতিক সভ্যতা যোগাযোগের জন্য ইচ্ছুক নাও হতে পারে। মহাজাগতিক উন্নত সভ্যতা হয়তো তাদের গবেষণার জন্য আমাদেরকে চিড়িয়াখানার মত আলাদা করে রেখেছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধার্থে। কিংবা তারা হয়ত কোন ‘গ্যালাক্টিক আইন’ মেনে চলে যা পৃথিবীতে বা অন্য কোন গ্রহে উদ্ভুত প্রাণের স্বাধীন বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করার বিরুদ্ধে। এটা নীতিগত (মানব সভ্যতাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য) বা কৌশলগত (মহাজাগতিক সভ্যতা হয়তো চিহ্নিত হতে চায় না অন্য কোন সভ্যতার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভয়ে) কারণে হতে পারে।

যদি পৃথিবী থেকে যোগাযোগের সীমানায় একটি মাত্র সভ্যতা থাকে বা সমভাবাপন্ন সভ্যতাসমূহ থাকে অথবা যদি এমন কোন আইন বিভিন্ন সভ্যতাসমূহের মধ্যে থাকে যে পৃথিবীকে আলাদা করে রাখবে সেক্ষত্রেই ‘জু হাইপোথেসিস’ বেশ কার্যকর। কিন্তু যদি এই মহাবিশ্বে একাধিক মহাজাগতিক সভ্যতা থেকে থাকে তবে এই অনুকল্পকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যেতে পারে।

মহাজাগতিক অন্তরীণ অনুকল্প (Cosmic Quarantine Hypothesis)

১৯৮১ সালে ফার্মি প্যারাডক্সের সমাধান হিসাবে মহাকাশ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড হ্যারিসন (Edward Harrision) শক্তিশালী আত্ম-নিয়ন্ত্রণ মেকানিজমের কথা উল্লেখ করেন। অন্য গ্রহে

ব্যাপক উপনিবেশ গড়ে তোলার আগ্রহী সভ্যতা অঞ্চল বৃদ্ধিকারক তাড়না দিয়ে তাড়িত হবে। কিন্তু আন্তঃনক্ষত্রিক পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যে বিপুল পরিমান প্রযুক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োজন তা এই আগ্রাসী আচরণকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। ফলশ্রুতিতে, ভিন্ন নক্ষত্রে পৌঁছানোর অনেক আগেই ওই ধরনের সভ্যতা নিজেদেরকে ধ্বংস করে তুলবে।

অদম্য অঞ্চল বিকাশের তাড়না যা একসময় লক্ষ লক্ষ বছরের জৈবিক বিবর্তনবাদে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, সেটাই একসময় দায় হয়ে দাড়িয়েছে প্রজাতির উপর যখন কোন প্রজাতি তার আত্ম-ধংসের চেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। মিল্কিওয়ে ছায়াপথে হয়তো আমাদের চেয়েও অনেক বুদ্ধিমান সভ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু তাদেরকেও অবশ্যই আমাদের মতো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুনির মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে।

তারপরও, ধরা যাক কোন একটা সভ্যতা আত্ম-ধ্বংস এড়িয়ে উপনিবেশ গঠন শুরু করে দিল। সেক্ষেত্রে সমস্ত সৌরজগতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ার কথা। কিন্তু হ্যারিসন আত্ম-নিয়ন্ত্রনের মেকানিজম ব্যর্থ হলেও অন্য একটা মেকানিজম এর কথা উল্লেখ করেছেন যা এই ক্ষেত্রে কাজ করতে এগিয়ে আসবে। হ্যারিসন মতে, এ ধরনের কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিকশিত সভ্যতা তা খেয়াল করবে এবং এ ধরনের প্রচেষ্টাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেবে।

উড়ন্ত চাকী (UFO)

উপরের অনুকল্পগুলো ছাড়াও ফার্মির গোলক ধাঁধার আরো অনেক সমাধান থাকতে পারে। ‘তারা সবাই কোথায়?’ ফার্মির এ প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর অনেকে ভাবেন বিভিন্ন সময় আকাশে দেখা ওই রহস্যময় উড়ন্ত চাকী বা ইউএফও (UFO) গুলোকে। সাধারণ মানুষ কল্পণাপ্রবণ : তারা ভাবেন মহাজাগতিক প্রাণীরা আমাদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়ম করে পৃথিবীর আকাশে চক্কর খাচ্ছে! উড়ন্ত চাকী বা ইউএফওগুলো তারই নমুনা। ইউএফও গুলোকে আকাশে দেখেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, অনেকে আবার এমন দাবীও করেছেন যে, তাদের কাউকে কাউকে মহাজাগতিক প্রাণীরা করায়ত্ব করে তাদের মহাকাশযানে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষায় অধিকাংশ দাবীগুলোরই অসারতা প্রমাণিত হয়। এর পেছনে কারণ হিসেবে মহাকাশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, মতিভ্রম, প্রচারের আলোয় আসার প্রবণতা, গন-সম্মোহন, হ্যালুশিনেশন কিংবা স্রেফ মিথ্যাচার বা জোচ্চুরীকে উল্লেখ করা যায়।

আকাশের যে সব বস্তুকে উড়ন্ত চাকী ভেবে প্রায়শঃই ভুল করা হয় সেগুলোর একটি তালিকা করেছিলেন আমেরিকার জ্যোতির্বিদ ডোনাল্ড মেনজেল; তাদের মধ্যে আছে : বিচিত্র

চেহারার বিমান, অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় দুর্ঘটনা কবলিত বিমান, কৃত্রিম উপগ্রহ, পাখির ঝাঁক, মেঘের স্তর থেকে প্রতিফলিত সার্চ লাইটের আলো, উজ্জ্বল কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো, প্রতিপ্রভ প্রাণীদেহ, উল্কা, শুক্রের মত উজ্জ্বল গ্রহ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, মেরুজ্যোতি এবং আরো কিছু বস্তু। কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের প্রধান এডওয়ার্ড ইউ কনডন ২১ বছর ধরে এউএফও'র উপর গবেষণা করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে : '২১ বছরের গবেষণায় এমন কিছুই বেরিয়ে আসেনি যা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ত্বরান্বিত করেছে। ভবিষ্যতের আরো গবেষণাও যে কোন আলো দেখাবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই।' আমেরিকার বিমান বাহিনীর 'প্রোজেক্ট ব্লু বুক' রিপোর্টেও বলা হয়েছে 'আমাদের ২২ বছরের অনুসন্ধানে ইউএফও সংক্রান্ত রিপোর্টগুলোর একটিকেও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে হয়নি।'

তারপরেও কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা কখনই থমকে থাকে নি, সেজন্যই কার্ল স্যাগান আর ড্রেকের মত স্বাপ্নিকেরা গবেষণা চলিয়ে গেছেন বহির্জাগতিক প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের প্রত্যাশায়, এক আন্তঃনাক্ষত্রিক সংস্কৃতির সন্ধানে। মহাবিশ্বে প্রাণ-সন্ধানী বিজ্ঞানী ব্রুস জ্যাকোস্কি মনে করেন, যে বিল্পবের সূচনা একদিন কোপার্নিকাস করেছিলেন পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিয়ে, আর ডারউইন এগিয়ে দিয়েছিলেন বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে মানবজাতিকে শিম্পাঞ্জীকূলের কাছাকাছি ঠেলে দিয়ে, সে অসমাপ্ত বিপ্লবই পূর্ণতা পাবে মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলে। কোপার্নিকাস যেমন প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী কোন বিশিষ্ট গ্রহ নয়, কিংবা ডারউইন যেমন বুঝেছিলেন মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোন 'বিশেষ সৃষ্টি' নয়, তেমনি মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলে বোঝা যাবে যে, পৃথিবীতে প্রাণের অভ্যুদয়ও কোন বিশেষ ঘটনা নয়, বরং মহাজগতের বিভিন্ন এলোপাথারি ঘটনার মধ্যে ঘটে যাওয়া স্রেফ এক প্রাকৃতিক অনিবার্যতা। কে জানে, হয়ত বিজ্ঞানীদের স্বপ্নকে সত্যি প্রমাণ করে মানব সভ্যতা একদিন পৌঁছে যাবে আন্তঃনাক্ষত্রিক সভ্যতার মিলন মেলায়, পূর্ণতা পাবে কোপার্নিকাসের 'অসমাপ্ত বিপ্লব'। কবে সেটা? কয়ক'শ কিংবা কয়েক হাজার বছরে? নাকি তারও বেশী? আমরা কেউ তা জানি না। আপনি বা আমি কেউ হয়ত বেঁচে থাকব না সে সময়, বেঁচে রবে আমাদের স্বপ্ন তখন।

অক্টোবর ২৫, ২০০৬

{অষ্টম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...